ভূমিকা : ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসনে জয়ী হয়ে ৩১৩ আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অস্বীকৃতি জানালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম অবনতির দিকে যেতে থাকে। হঠাৎ ১ মার্চ আকস্মিকভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া সমগ্র জাতিকে স্তম্ভিত করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বাংলার মানুষ তীব্রক্ষোভ ও আক্রোশে ফেটে পড়ে। তারা অপেক্ষা করতে থাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের দীপ্ত ঘোষণার জন্য। সকলের অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ গর্জে ওঠে ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রের সামনে। তিনি সেদিন পেশ করেন বিশ্বের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ভাষণ। মাত্র ১৯ মিনিটের ভাষণে তিনি বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাসের পুরো ক্যানভাস তুলে ধরেন। তার এ ভাষণ বিশ্বের প্রথম ও সর্বশেষ মুখে উচ্চারিত ক্ষুদ্রতম কালজয়ী মহাকাব্যের অনুপম দৃষ্টান্ত। ২০১৭ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম বার্তা ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর *Memory of the World Register*-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে ইউনেস্কো কর্তৃক *'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য'* হিসেবে।

বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য : যুদ্ধ ও সামাজিক বিপর্যয় এবং বিশ্বজুড়ে লুটপাট, অবৈধ বাণিজ্য, বিনাশ, সংরক্ষণের অপর্যাপ্ত উদ্যোগ ও অর্থায়নের অভাবে ঝুঁকিতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলোকে সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সচেতনতার তাগিদে UNESCO ১৯৯২ সালে *Memory of the World Register* কর্মসূচি চালু করে। এর মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক তথ্যাদি সংরক্ষণ ও সেগুলো সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য করা। এ তালিকায় ঠাঁই পেতে হলে পর্যাপ্ত গ্রহণযোগ্যতা ও ঐতিহাসিক প্রভাব থাকতে হয়। ১৪ সদস্যবিশিষ্ট আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি (IAC) পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এই রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য দলিলসমূহের নাম সুপারিশ করে। এরপর নিয়ম অনুযায়ী তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন UNESCO'র মহাপরিচালক। UNESCO ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পরপর *Memory of the World Register* প্রণয়ন করে আসছে। কোনো দলিলের বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে UNESCO'র স্বীকৃতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে ঐ দলিলের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা ও ঐতিহাসিক প্রভাবের বিষয়টি স্বীকৃত হয়। আর এ তালিকাভুক্ত করার মধ্য দিয়ে

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহাসিক ঘটনা সংরক্ষণ ও সবার কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

৭ মার্চের ভাষণের বিশ্বস্বীকৃতি : ২৪-২৭ অক্টোবর ২০১৭ ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সংস্থাটির আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি (IAC) বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো ১৩০টি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল, নথি ও বক্তৃতাকে যাচাই-বাছাই করে ৭৮টি বিষয়কে সংস্থার *Memory of the World Register*-এ অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে। এরপর ৩০ অক্টোবর ২০১৭ UNESCO'র মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ঐ ৭৮টি বিষয়কে *Memory of the World Register*-এ অন্তর্ভুক্তির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ অন্যতম। এটাই UNESCO'র এ যাবৎ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৪২৭টি প্রামাণ্য ঐতিহ্যের মধ্যে প্রথম অলিখিত ভাষণ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে *'বিশ্ব প্রামাণ ঐতিহ্য'* হিসেবে স্বীকৃতি পেতে UNESCO-কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিল সরবরাহ করেন ফান্সের প্যারিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মো. শহিদুল ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। এ জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ঐ স্বীকৃতির স্বপক্ষে ১০টি প্রয়োজনীয় নথি, প্রমাণপত্র ও তথ্য জমা দেয়া হয়। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে তথ্য মন্ত্রণালয়।

৭ মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি চেয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ১২ পৃষ্ঠার এক আবেদন করা হয়েছিল, যাতে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। ঐ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করে দুই বছরের প্রক্রিয়া শেষে একে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

এ সম্পর্কে ইউনেস্কোর ভাষ্য : *The speech effectively deaclared the independence of Bangladesh. The speech constitutes a faithful documentation of how the failure of post-colonial nation-states to develop inclusive, democratic society alienates their population belonging to different ethnic, cultural, linguistc or religious groups. The speech was extempore and there was no written script.*

অর্থাৎ ইউনেস্কোর বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ কার্যকর অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে। এ ভাষণ গোটা বিশ্বের উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের সর্বজনীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার এক অকাট্য প্রামাণিক দলিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল একটি উপস্থিত-বক্তৃতা অর্থাৎ ভাষণটির কোনো

লিখিত রূপ ছিল না। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের সংবিধানের এই চার মূলনীতি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথাই বলেছেন। তিনি বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির কথা বলেছেন। তাঁর বক্তৃতায় বাঙালি জাতির উপর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নির্যাতনের কারণ বর্ণনা দিয়েছেন।

বরং তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল গণতন্ত্রের গুণগত মান। ৭ মার্চের ভাষণে তাই তিনি বলেছেন: *"আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।"*

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব : এ ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বিশ্ব ইতিহাসে নতুন এক শিকরে পৌঁছে যায়। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর উদ্দীপ্ত ঘোষণায় বাঙালি জাতি পেয়ে যায় স্বাধীনতা ও গেরিলাযুদ্ধের দিক-নির্দেশনা। এর পরই দেশের মুক্তিকামী মানুষ ঘরে ঘরে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ বজ্র নিনাদে আসন্ন মহামুক্তির আনন্দে বাঙালি জাতি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত বাঙালি ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যায় কাঙ্ক্ষিত মুক্তির লক্ষ্যে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনার পথ ধরেই ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লাখো প্রাণের বিনিময়ে বিশ্বমানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব নিচে তুলে ধরা হলো :

১. গণতন্ত্রের ডাক : বঙ্গবন্ধু তার ১০৯৫ তথা ১১০৮ শব্দের ভাষণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দেশের শাসনতন্ত্র তৈরির আকুল আবেদন ও তীব্র আকাঙ্খা পেশ করেন। তিনি বলেন, *'নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো'।* গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার এ ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. বৈষম্যের ইতিহাস উপস্থাপন : বঙ্গবন্ধু ভাষণের প্রথম পাকিস্তান আমলের দীর্ঘ তেইশ বছরের বৈষম্যমূলক ইতিহাস তুলে ধরেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ ও শাসন করতে থাকে, গড়ে ওঠে বৈষম্যের পাহাড়। সামরিক বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

সেনাবাহিনীতে ৯৫ ভাগই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি, অর্থনৈতি ক্ষেত্রে এ বৈষম্য ছিল আরও ব্যাপক। ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি, বিদেশি মিশনসমূহের হেড অফিস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে অবাধে অর্থ পাচার সহজ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ কৃষক ন্যায্য মূল্য পেত না। শিল্প কালকারখানা অধিকাংশ হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আচরণ ছিল বিমাতাসুলভ। পূর্ব বাংলার জননেতা আবুল কাশেম ফজলুল হকসহ জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় রাখার চেষ্টা করা হয়। এমনকি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি আরম্ভ করে। ফলে জনগণ এসব বৈষম্যের প্রতিবাদে স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধিকারের দাবি তোলে। আর তখনই পাক-গোষ্ঠীর অস্ত্রের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠে নিরীহ জনগণের ওপর।

৩. নির্যাতনের পর্ণাঙ্গ চিত্র : বঙ্গবন্ধুর ভাষণে বাঙালি জাতির ওপর দীর্ঘ তেইশ বছরে যে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে। জাতির জনক তার ভাষণের তৃতীয় লাইনেই বলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম রাজশাহী রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে- তিনি ভাষণে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ২৩ বছরের শাসনামলকে বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন *'২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষ নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস'*। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পাক বাহিনী রক্ত ঝরিয়েছে। পশ্চিমা গোষ্ঠী চেয়েছে হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষকে দমন করে রাখতে।

৪. সংগ্রামী চেতনার ডাক : স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবিতে বাঙালি জাতি যে সংগ্রামের সূচনা করে আত্মাহুতি দেয় বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে তা তুলে ধরেছেন। নানাদিক থেকে বঞ্চিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত জনগণ তাদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য আন্দোলন চালাতে থাকে। মৃত্যুর মুখেও নির্ভয়ে এগিয়ে যায় এবং রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। দেশকে মুক্ত করার জন্য জনগণ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালালেও পাক সামরিক বাহিনী গুলি চালায় নিরীহ জনগণের ওপর। তবুও সংগ্রামী জনগণ পিছপা হয়নি।

৫. বাঙালি জাতীয়তাবাদ : বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, অবাঙালি সবার কথাই বলেছেন। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোনো নেতা করতে পারেনি।

তিন সেদিন সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে একতার জলন্ত শিখার বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তার সম্মোহনী বক্তব্যের মাধ্যমে, যা পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল।

৬. বাঙালির ঐক্য : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালি জনগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ঐক্যবদ্ধ জনগণকে দেখেই বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার ডাক দেন। দেশকে মুক্ত করার জন্য সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৭. নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য : সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় আশা প্রকাশ করে, তারা তার আহ্বানে সাড়া দেয়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে জগণ রাস্তায় নেমে আসে। গড়ে তোলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

৮. অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি : বঙ্গবন্ধু সেদিন তার ১৯ মিনিটের ভাষণে মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির অভিপ্রায় আবেগাপ্লুত অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশ করেন। তিনি দারিদ্র্য মুক্ত, ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং মাতৃভাষায় নির্বিঘ্নে কথা বলতে পারে এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, *'এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে'*।

৯. প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা : বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রশাসনিক গুরুত্বও অপরিসীম। তিনি বলেন, *'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক'*।

১০. গেরিলা যুদ্ধের নির্দেশনা : তিনি অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে যে কৌশল প্রয়োগের নির্দেশনার দিয়েছেন তা, খুবই গরুত্ববহ। তিনি বলেন, *'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, রাস্তাঘাট যা যা আছে আমি যদি হুকুম দেবার না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে, আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব'*।

১১. মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণে এই বলে মুক্তির সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন যে, *'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'*। তার এই নিষ্কম্প ঘোষণা বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা দিয়েছিল। জাতির উদ্দেশ্যে এই ছিল তার যুদ্ধপূর্ব শেষ ভাষণ। তাই এতে তিনি যুদ্ধের দিকনির্দেশনা দিয়ে পস্তুতির কথা বলেছিলেন। তখন বাঙালির হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। তাই যার যা আছে তা নিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তার এই সংগ্রাম ঘোষণায় যে পশ্চিমাদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে তা তিনি ধারণা করেছিলেন। সেজন্য তৎকালীন হানাদার শাসকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। তিনি তার অনন্য ভাষণে মুক্তিসংগ্রামের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলেন।

১২. চার দাবি : বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে সুস্পষ্টভাবে চারটি দাবি পেশ করেন, যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ তার এই দাবিগুলো তাকে যেন বিচ্ছিন্নতাবাদীর অপবাদ না দিতে পারে তার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তার দাবিগুলো ছিল (i) সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে (ii) সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে (iii) যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে এবং (iv) জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লাখ জনতার সামনে যে তেজোদ্বীপ্ত জ্বালাময়ী কাব্যিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা বাঙালির মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বাঙালিকে স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মত্ত করেছিল্ বাংলার মানুষ বর্ণ-গোত্র ও ধর্ম ভুলে গিয়ে দেশের জন্য হাসিমুখে জীবন দিতে শপথ করেছিল। ইউনেস্কো এ ভাষণকে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার এর মাধুর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও গরুত্ব এবং বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাস এখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে-ছড়িয়ে বহু-ভাষী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এটি এখন শুধু বাংলাদেশের নয় বরং সারা বিশ্বের সম্পদে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব সংস্থার স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী গবেষণা হবে, বিশেষ করে জ্ঞানান্বেষী তরুণ সমাজের মনে এটি স্থান পাবে।